উড়ালগদ্য

কাজী জহিরুল ইসলাম

গ্রীন হাউস থেকে ব্রথেল

দুই হাজার সালের গোড়ার দিকে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের এক জলন্ত জনপদে ঢুকে পড়লাম, হাতে শান্তির নীল পতাকা। আমার কাজ হলো কসোভোর ষোলোর্ধ জনগনকে ভোটার ও সিভিল রেজিষ্ট্রেশনের আওতায় আনা। জাতিসংঘের একেকটি শান্তিরক্ষা মিশনের পেছনে একেকটি বৃহৎ শক্তি অর্থের যোগান দিয়ে থাকে। কসোভো মিশনের চালিকাশক্তি হলো নেটো দেশসমূহ। পঞ্চাশ হাজার নেটো আর্মি সাড়ে দশ হাজার বর্গমাইলের এই ক্ষুদ্র টেরিটোরিতে জালের মতো ছড়িয়ে আছে। এ কথা আজ কারোরই অজানা নেই যে আলবেনিয়ান-সার্বিয়ান দ্বন্দ্বের পরিণতিই হলো কসোভোর রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ।

যুদ্ধোত্তর কসোভোর ত্রিশটি মিউনিসিপ্যালিটির একটি ভিটিনা, আমার কর্মস্থল। এখানকার দুটি রেজিস্ট্রেশন সেন্টারের দায়িত্বে নিয়োজিত ১২ সদস্যের একটি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছি আমি। আমাদের কোর সুপারভাইজার ২৬ বছরের ব্রিটিশ তরুণী ফেনেলা ফ্রস্ট, ওখানে পৌঁছবার আগেই, আমার জন্য একটি বাসা ভাড়া করে রেখেছেন। ছলছল করে বয়ে চলা এক চিলতে পাহাড়ী নদী, মুরোভি। মুরোভির এক পাড়ে আমার বাড়ি, গ্রীনহাউস। অন্য পাড়ে একটি ঝকমকে শাদা দোতলা বাড়ি, কি নাম হতে পারে ওর? হোয়াইট হাউস! তৃতীয় রাতটি মুরোভির ওপরের সরু কাঠের সাঁকোটি পেরুবার আগেই হঠাৎ বিকট শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেলো। থরথর করে কেঁপে উঠলো গ্রীন হাউজের সমস্ত আসবাবপত্র, ঝরঝর করে ভেঙ্গে পড়লো কাচের জানালাগুলি। শব্দের যে কি শক্তি সেই রাতেই আমি তা টের পেয়েছি। মনে হচ্ছিলো বিছানা থেকে ছিটকে পড়ে যাবো। আমার সেইভ দি চিলড্রেনের সহকর্মী রিণা রায়ের একটি কথা মনে পড়ে গেলো। কসোভোর উদ্দেশে রওনা হবার পথে তিনি বলেছিলেন, 'যান, একটা একাত্তুর একাত্তুর স্বাদ পাবেন'। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে টের পাচ্ছি, 'একাত্তুর একাত্তুর' স্বাদটা কতো আনন্দের! ভয়ে আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে শুরু করেছে।

কে বা কারা হোয়াইট হাউসটিতে গ্রেনেড চার্জ করেছে। কাল যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো একটি ঝকমকে প্রাসাদ, আজ সেখানে শতশত আমেরিকান আর্মি, একটি ধ্বংশস্তুপের জিম্মাদার। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, গ্রীন হাউজে আর এক মুহূর্তও না। চুলোয় যাক মুরোভি নদীর প্রবাহিত জলধারার অমিয় সঙ্গীত আর গ্রীন হাউজের সবুজ বনানী। এবার দলে বলে এসে উঠলাম শহরের শেষ প্রান্তের একটি দোতলা বাড়িতে। আমরা চার বাঙালী, অন্য তিনজন হলেন, বাংলাদেশ ইলেকশন কমিশনের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি

কমিশনার আ.স.ম. অনোয়ারুজ্জামান, একই পদে কর্মরত খুরশিদ আনওয়ার এবং অভিজ্ঞ উন্নয়নকর্মী সৈয়দ মুশীর হোসেন বোখারী। চারজনের জন্য চারটি শোবার ঘর, আর সকলের জন্য একটি যৌথ ড্রয়িং কাম ডায়নিং রুম। আমাদের নতুন বাসা থেকে মাত্র দু'শ মিটার দূরে জাতিসংঘের আরেক বাঙালী অফিসার থাকেন, তিনি কবি জাহিদ হায়দার। আমরা যেহেতু দলে ভারী, তাই প্রতিদিন সন্ধ্যার আড্ডটি জমে ওঠে আমাদের এখানেই, জাহিদ হায়দার আমাদের রোজকার মেহমান। বারান্দা দিয়ে হাত বাড়ালেই লাল লাল পাকা চেরীতে মুঠো ভরে যায়। তখন মে-এর মাঝামাঝি সময়, নিচে প্রকান্ড ফল-ফুলের বাগান। আঙুরের লতানো ডালগুলো ভারী হয়ে ওঠেছে, আপেলগুলো ফুলে বেশ টসটসে হয়ে উঠছে। উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঝাকরা চুলের নাশপাতি গাছটিতে তখন পাতার চেয়ে নাশপাতিই চোখে পড়ে বেশী। আর দূরে দাঁড়িয়ে থাকা লুবোটেন পাহাড়ের চূড়োটি তখনো একটি শাদা বরফের টুপি পরে আমাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে।

বাড়িটির নিচতলায় মূল রাস্তার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ ক'টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। একটি কফি গ্রাইন্ডিং শপ, একটি মেয়েদের চুল কাটার সেলুন আর একটি রহস্যময় বার। একদিন বিকেলে জাহিদ হায়দার জানালেন, আপনাদের বাড়ির নিচতলায় যে একটি রহস্যময় বার আছে এটা জানেন? আমরা সকলেই আমাদের কৌতুহলি চোখগুলোকে বের করে দিয়ে উৎকর্ণ হলাম। তিনি বললেন, 'প্রতিদিন সন্ধ্যর পর ওখানে ৫/৬টি মলদোভিয়ান সুন্দরী আসে, আদিরসের খেলা চলে সারারাত'। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ছোট ছোট প্রজাতন্ত্রগুলো অতি দ্রুত স্বাধীনতা পায় ঠিকই কিন্তু দারিদ্রের এক ভয়াল অন্ধকার নেমে আসে সাধারণ জনগনের জীবনে। দারিদ্র আর সেক্স-ফ্রি সোসাইটি। পতিতাবৃত্তির জন্য সোনায় সোহাগা। অতি দ্রুত কোনো কিছু বুঝে উঠবার আগেই এইসব ছোট ছোট প্রজাতন্ত্রের তরুণীরা পতিতাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে গ্রহন করতে শুরু করে। দালালের মধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। মধ্যপ্রাচ্যে রয়েছে এর জমজমাট বাজার। যুদ্ধবিধ্বস্ত কসোভোর অর্থনৈতিক অবস্থা যা-ই হোক না কেনো, এখানে রয়েছে নেটো এবং জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় কর্মরত প্রায় ষাট হাজার নারী-পুরুষ। যাদের প্রায় সবাই পরিবার পরিজান থেকে বিচ্ছিন্ন। এই বিশাল মার্কেট অপরচুনিটি-টা ধরে ফেলার জন্য দারিদ্রক্লিস্ট মলদোভিয়ার যৌনকর্মীরা দলে দলে কসোভোতে পাড়ি জমাবে---এতে অবাক হওয়ার তেমন কিছু নেই। কিন্তু আমরা যে একটা ব্রথেলের মধ্যে বসবাস করছি, এইটা জানতে পারি আরো দু'দিন পরে।

মাঝরাতে হঠাৎ তীব্র আলোর ঝলকানিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাকিয়ে দেখি দোতলার জানালায় আগুনের লেলিহান শিখা। জেগেই চিৎকার শুরু করে দিলাম। অন্য তিন সহকর্মীও ঘুম থেকে ধরফর করে উঠলেন। আমরা আমাদের ওয়্যারলেসগুলোকে ব্যস্ত করে তুললাম। এবং অতি দ্রুত বিল্ডিং ছেড়ে পেছনের বাগানে ছুটে গেলাম। প্রায় কুড়ি মিনিট পর যখন ইউএন সিকিউরিটি দমকল বাহিনি নিয়ে এসে উপস্থিত হলো, তখন আমরা বাড়ির সদর দরোজা খুলে বাইরে, রাস্তায় নেমে এলাম। ততক্ষণে শুধু বারটিই না, সেলুন এবং কফি গ্রাইন্ডিং শপটিও পুড়ে ছাই। স্থানীয় মুসলমানেরা সঙ্গত কারণেই আদিরসের এই ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানটিকে জ্বালিয়ে দিয়েছে।

পরদিন সকালে অফিসে যেতেই আমাদেরকে ঘিরে ধরলো সবাই। ফেনেলা একটি মুচকি হাসি দিয়ে বললো, তোমরা না কি একটা ব্রথেলে থাকো?

আইভরিকোস্ট
১৭/০২/০৬